তখন ও এখন

□□□□ □□□

(১২)

আমাদের ছোটবেলায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মত কোন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পাইনি , ছিলও না যা আমার পাঠ্যাভাস গড়ায় কোনরূপ নির্দেশনা দেবে। আমার ছেলেমেয়ে বিদ্যালয় থেকেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নির্দেশনায় বই পড়ে এর উপরে আবার পরীক্ষাও দিয়েছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ধারাবাহিকভাবে সুপারিশকৃত বই তাদেরকে আলোকিত মানুষ হবার পথের মানচিত্র দিয়েছে। এখন সে পথে হাঁটা না হাঁটা তাদের সিদ্ধান্ত। মা হিসেবে তো আমার সহযোগিতা না হয় উহ্যই রইল।

আমার মা পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্য কোন বই পড়া অনুমোদনই করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল গল্পের বই পড়লে পাঠ্য বই পড়ায় মন বসবে না। গল্পের বই পড়া মানে সময়ের অপচয়। তাঁর এ ধারণা ভাঙ্গানোর মত আমার তখন মেধা ও সাহস কোনটাই ছিল না।

মা এখনও মনে করেন আমার পরীক্ষার ফলাফল আরও ভাল হত যদি আমি লুকিয়ে লুকিয়ে গল্পের বই না পড়তাম। যদিও মা নিজে পড়তেন, তবে ঠাকুর দেবতার বই, রাজা-রাণীর কাহিনী, রাক্ষস খোক্ষসের গল্প আর ভূত-প্রেতের বই। অসামঞ্জস্য ঠেকলেও সত্যি। ঠাকুর দেবতা আর আর ভূত-প্রেতের সহবস্থান। বাবা পাবলিক লাইব্রেরী থেকে এনে দিতেন।

বাড়িতে মহাভারত, রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ ছিল। পদ্মপুরাণ শ্রাবণ মাসের প্রতিদিন বিকেলে বা সন্ধ্যায় ধূপ দীপ জ্বালিয়ে পড়া হত। সাথে বাদ্য সহযোগে গান। পরে শ্রাবণের সংক্রান্তিতে মনসা পূজা। তবে মহাভারত ও রামায়ণ মা সময় পেলেই পড়তেন। বইগুলো কখনই শেষ করতে দেখিনি। আরেকটি বই মা কাকীমারা বার বার পড়তেন। বইটি বড় কাকীমার বৌভাতে উপহার হিসেবে পাওয়া। গোপাল কৃষ্ণ বসাকের লেখা ‘রিক্তের বেদন’। এ বইটি পড়তে পড়তে তাদেরকে আঁচলে চোখ মুছতেও দেখেছি।

পরে আমিও লুকিয়ে চুকিয়ে এ বইটি পড়েছিলাম এবং তখন ছোটবেলার মন অন্ধ রঞ্জনের জন্য ব্যথাতুরও হয়েছিল।

বাবা ধ্রুপদ সাহিত্য পড়তেন। খেতে বসেও হাঁটুতে বই রেখে পড়তেন। কোন কিছু লাগবে কি না জিজ্ঞেস করলে বাবা কখনও একবারে শুনতে না পেলে মা রাগ করতেন। এ রাগে কিছুটা ক্ষোভও থাকত, কারণ মায়ের পড়ার সময় বের করা সহজ ছিল না। বাবার এত আয়েসীপনায় মায়ের হিংসা না লাগাটাই হত অস্বাভাবিক। মা - বাবার বই পড়ার স্তরে যে মানসিক পার্থক্য ছিল তা নিয়েই ঘর করা চলেছিল। আজকালও শতকরা নব্বই ভাগ ঘর সংসার এভাবেই অসম বয়স বা মানসিকতা অথবা দু'টো নিয়েই চলে। সমাজ ও সংসার অবশ্য তা-ই আশা করে। সমকক্ষ সাথী কেউ চায় না।

আমরা বন্ধু- বান্ধবরা মিলে মিশে বই পড়তাম। বই --- গল্পের বই বন্ধুদের মধ্যে ধার করে পড়ার প্রচলন ছিল। একটা বই যোগাড় করতে পারলে দশটা বই পড়া যেত অনায়াসে। সাধারণত উপন্যাসই পড়া হত। নীহার রঞ্জন গুপ্ত, ফাল্গুনী মুখ্যোপাধ্যায়ের লেখা। দস্যু বনহুরের সিরিজও জনপ্রিয় ছিল। যে কোন একটা বই প্রায় সব বন্ধুদের মধ্যেই ঘুরত --- হাত বদল হুত। যে আগে পেত সে অন্যদের কাছ থেকে সারাক্ষণই তাগাদা পেত বইটি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য। তাগাদার ভয়ে ও বিরক্তিতে অনেকেই কোন বই আগে নিতে চাইত না। আমি অবশ্য কোন বই সবার আগে নিতে চাইতাম। বন্ধুদের অগে পড়ে ফেলার মজাই আলাদা। মনে হত যেন সবার আগে এক অনাস্বাদিত স্বাদ পেলাম । নিজেকে একটু আধটু জ্ঞানী জ্ঞানীও মনে হত বৈকি। যেন কলম্বাসের মতই একটা রাজ্য আবিষ্কার করে ফেলেছি। পরে সে রাজ্যে বন্ধুরা ঢুকবে। অবচেতনে বেশ অহংকার অহংকার ভাব অনুভূত হত। তবে একটু অস্বস্তিও ছিল। বইটি নিয়ে আলোচনা করার সাথী পেতে দেরি হত। শর্ত ছিল সবার পড়া হলেই কেবল আলোচনা চলবে। ইনিয়ে বিনিয়ে কাহিনীটি কী হতে পারত এর বিশ্লেষণ চলত। পঠিত বইয়ের আবার তালিকাও রাখতাম লেখকের নামসহ।

নীহার রঞ্জন গুপ্ত, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় আর দস্যু বনহুরের সিরিজ একটু বড়বেলায় আর পড়িনি। ধীরে ধীরে ধ্রুপদ সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছি। শরৎচন্দ্র, বিভূতি, মানিক, যাযাবরের দৃষ্টিপাত। 'দিল্লীতে উড়োজাহাজে যাওয়া মানে কমলালেবু না খেয়ে ভিটামিন সি খাওয়ার মত। --- বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ কেড়ে নিয়েছে আবেগ।' দৃষ্টিপাত বইয়ে এমনি দুটি বাক্য ছিল। বাংলা দ্বিতীয় পত্রে বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ রচনায় দ্বিতীয় বাক্যটি কোটেশন হিসেবে লিখেছি। দৃষ্টিপাত বইয়ের মত বিভিন্ন বইয়ের বা কবিতার বিশেষ বাক্য ও পংক্তি মুখস্তও করে রাখতাম। ফাঁকে ফোঁকরে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বলেও দিতাম। উপন্যাসের সাথে সাথে ছোটগল্প ও কবিতার দিকে ঝুঁকেছি।
দৃষ্টিপাত বইয়ের আরেকটি বাক্য তো আমার জীবনবোধে প্রকটভাবে প্রভাব ফেলেছে। বাক্যটি এখনও ভুলিনি --- 'সহজ হওয়ার মধ্যে আছে কালচারের পরিচয়, আড়ম্বরের মধ্যা আছে দম্ভ। সে দম্ভ কখনো অর্থের, কখনো বিদ্যার,কখনো প্রতিপত্তির'। সহজ হওয়ার মধ্যে আছে কালচারের পরিচয় --- এ সহজ হওয়া শব্দটি আমার মগজে, হৃদয়ে, আচার-আচরণে, মনোভাবে, দৃষ্টিভঙ্গিতে গেঁথে গিয়েছিল। সংস্কৃতিবান হওয়ার জন্য কোন কসরত নয় --- কোন দুর্লঙ্ঘ লক্ষ্য নয় --- শুধু সহজ সরল জীবনাচারের চর্চা করেছি যাপিত জীবনের প্রত্যেক স্তরে। কখনও কোন দুর্ভেদ্যতার জাল বুনিনি, কোন দুর্বোধ্য আচরণ করিনি। ছাত্রাবস্থায় বন্ধুদের সাথে না, সংসার জীবনে না, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে না। অনেকে মনে করেন আমার কোন আড়াল নেই --- পর্দা নেই। আমি মনে করি আমার কোন মুখোস নেই। মুখ ও মনে দু'রকম চর্চা করি না। অনেক শুভাকাংঙ্খীরা পরামর্শ দেয় কূটনৈতিক না হলেও কৌশলী হতে। কিন্তু আমি তা পারি না। নিজের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করতেও কুন্ঠিত হই না।
সহজ হওয়া শব্দটি আমাকে আজীবন সুরক্ষা করে চলেছে। আমার সংস্কৃতি হল আমার সহজলভ্যতা, আমার প্রাকৃতিক পদচারনা, মুক্ত --- স্বচ্ছ মন আমার যাপিত জীবনকে রেখেছে ঝঞ্ঝাটবিহীন।

আরও পরে পড়েছি প্রবন্ধ। আহমদ শরীফ স্যারের ‘বিচিত চিন্তা’ তো বহুবার পড়েছি।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা আমাকে বনালী ঘাস পাতা এবং গুটায়ও সৌন্দর্য খুঁজতে শিখিয়েছে।

তাঁর ‘বনলতা’ কবিতা পড়ে বন্ধুরা যখন আলোড়িত আমি তখন ‘বনলতা’ কাব্যে গ্রন্থেরই ঐ কবিতাসহ ‘কমলালেবু’ কবিতা নিয়েও বিভোর ----

‘আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস হয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষূর বিছানার কিনারে।’

তবে আমার ছেলেমেয়ে যে বয়সে তাত্বিক বই পড়ে আমি সে বয়সে সে সব বই পড়তে পারিনি।

আমি আমার মায়ের ঠাকুর দেবতা, রাজা-রাণীর কাহিনী, রাক্ষস খোক্ষসের গল্প আর ভূত-প্রেতের জগৎ থকে বেরিয়ে এসেছিলাম। আর আমি যে বয়সে ‘আরজ আলী মাতব্বর’ পড়েছি এর চেয়ে দশ বছর আগে আমার ছেলেমেয়ে এ বই পড়ে ফেলেছে। কিছু কিছু লেখকের বই তো আমি তাদের সুপারিশে পড়েছি, যেমনঃ কহলিল জিব্রান। পাঠক হিসেবে আমার চেয়ে তাদের অগ্রগামিতা দেখে মা হিসেবে আমি গর্বিত। এটাই কালের পরিক্রমার ইতিবাচক ফসল। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সামনে এগিয়ে যাওয়া। এটিই যুগের অগ্রগতির ধারা। মানব সভ্যতা তো এভাবেই প্রবাহমান।

গীতা দাস
ঢাকা
৩ আষাঢ়, ১৪১৫/ ১৭জুন, ২০০৮
grdas2006@yahoo.com